KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কলকাতা (২য় সিরিজ) শ্রাবণ, পৌষ-চৈত্র
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৪ শ্রাবণ ১৩২৪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪ চৈত্র ১৩২৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস।

—:০:—

বাঙ্গালী যে নিজের দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহহীন, স্বদেশের প্রাচীন কাহিনীর জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ, কিছুদিন পূর্ব্বেও এই সব কথা তুলিয়া আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিয়া এ বিষয়ে সজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন এখন কাটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার গ্রাম খুঁজিয়া, মাটী খুঁড়িয়া বাঙ্গালীই এখন তাম্রশাসন এবং শিলালিপি বাহির করিতেছে, বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে, বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাহার ঐতিহাসিক তথ্য ও মূল্য নির্ণয় করিতেছে। বাঙ্গালী ঐতিহাসিককে বাদ দিয়া এখন আর বাঙ্গলার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের আকাশে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে আশা করা যায় ইতিহাসের মশাল তাহার একটা কোণ রক্তিম করিয়া রাখিবে।

আমাদের এই নবীন ইতিহাস চর্চ্চায় যাঁরা অগ্রণী তাঁরা একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিতেছেন। তাঁরা বলেন তাঁরা যে ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা করিতেছেন তাহা পুরাণো ধরণের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়। তাঁদের রচিত ইতিহাস 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাস, এবং তাঁরা যে প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করেন তাহা 'বিজ্ঞানানুমোদিত-ঐতিহাসিক-প্রণালী'।

ইতিহাসের সম্বন্ধে এই 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'বিজ্ঞানুমোদিত' প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির প্রকৃত অর্থটা কি তাহার আলোচনার সময়

হইয়াছে। কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়ার, আর সকল রকম বিদ্যার আলোচনাকেই বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে, গত শতাব্দীর ইউরোপের ন-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজে। ইউরোপ এখন আবার এই রোগটাকে দূর করিতে সচেষ্ট। সে দেশ হইতে বিদায় লইয়া ব্যাধিটা যাহাতে আমাদের ঘাড়ে আসিয়া না চাপে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা এ দেশে যা একবার আসে তাতো আর সহজে বিদায় হয় না; তা শক হূণই কি আর প্লেগ ম্যালেরিয়াই কি। বিশেষতঃ দুর্ব্বল শরীরে সকল রকম রোগই প্রবল হইয়া উঠে। আর দেহের রোগের চেয়ে মনের ব্যাধি যে বেশী মারাত্মক তাহাতেও কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যে বিদ্যার চর্চ্চাই করি না কেন তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছার নিদান হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি, আর সেই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য। প্রথমটীতে পণ্ডিতকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জনসাধারণকে অভিভূত করিয়াছে দ্বিতীয়টী। রেল, জাহাজ, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা, বন্দুক, কামান ইহাই হইল জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রকট মূর্ত্তি। এমন অবস্থা বেশ কল্পনা করা যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-গুলি ঠিক আজকার অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু সেগুলিকে ঘরগৃহস্থালীর কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাপ ও বাষ্পের সকল ধর্ম্মই জানা আছে কিন্তু রেল ষ্টীমার তৈরী হয় নাই। তাড়িত ও চুম্বকের নিয়মগুলি অজ্ঞাত নাই কিন্তু ঘরে ঘরে বিনা তেলে আলো জ্বলে না, বিনা কুলীতে পাখা চলে না। ফ্যারাডে ও

ম্যাক্সওয়েল জন্মিয়াছেন কিন্তু এডিসনের জন্ম হয় নাই। যদি সত্যই এই ঘটনাটা ঘটিত, তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আজ যে আদর ও মর্য্যাদা আছে তাহার কিছুই থাকিত না। এবং কি ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে কোনও পণ্ডিতই নিজের শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেন না। কারণ এই ব্যস্ততার মূলে আছে শাস্ত্রটাকে 'বিজ্ঞান' নাম দিয়া জনসমাজে জড়বিজ্ঞানের প্রাপ্য যে মর্য্যাদা তাহার কিছু অংশ আকর্ষণ করিবার লোভ। 'নামে যে কিছু যায় আসে না' এ কথাটা কবি বসাইয়াছেন প্রেমোন্মাদিনী কিশোরীর মুখে, এবং সেইখানেই ও তত্ত্ব শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের অর্দ্ধেক কাজ নামের জোরেই চলিয়া যাইতেছে, এবং পণ্ডিত-সমাজকেও সে সমাজ হইতে বাদ দিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

নিজের শাস্ত্রকে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রালোচনার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া নিজের ও পরের মনকে বুঝাইবার যে ইচ্ছা তাহার আরও একটু গভীরতর কারণ আছে। যখনি কোনও একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তখনি সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালী-টাকে সব তালার একমাত্র চাবী মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্রেই সম্ভব অসম্ভব ফললাভের চেষ্টার পরিচয়, ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে। দশমিক রাশির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীসে যখন পাটিগণিতের প্রতিষ্ঠা হইল তখন এই রাশি-ক্রমটীর গুণ আর শক্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কারণ নাই। যে গণনা মেধাবী পণ্ডিতেরও

দুঃসাধ্য ছিল ইহার বলে শিক্ষার্থী শিশুও তাহা অনায়াসে সমাধান করিতে লাগিল। এমন ব্যাপারে লোকের মন স্বভাবতঃই উৎসাহে ও আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা। ফলে এই রাশিক্রমের নিয়ম ও প্রণালীকে সকল রকম বিদ্যায় প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। এবং অবশেষে পিথাগোরাস্ ঠিক করিলেন যে জগৎটা রাশিরই খেলা, রাশিক্রমেরই একটা বৃহত্তর সংস্করণ। সুতরাং এই রাশিক্রমের হের-ফের আরও ভাল করিয়া করিতে পারিলে বিশ্বসংসারের কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিবে না। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বীজগণিতের প্রয়োগে জ্যামিতি-শাস্ত্রের হঠাৎ আশ্চর্য্যরকম উন্নতি হইল তখন পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে স্থির করিলেন যে জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী। অমন যে ধীর স্থির বৈদান্তিক স্পিনোজা তিনিও তাঁর দর্শনশাস্ত্রটীকে জ্যামিতির খোলসে আবদ্ধ করিলেন। এখন সেই কঠিন খোলস অতিকষ্টে সরাইয়া তবে তাঁর চিন্তার রস গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর আসিল নিউটনের আবিষ্কৃত গণিতের পালা। নিউটন যখন তাঁর গণিতের সাহায্যে গ্রহ উপগ্রহের সমস্ত গতিবিধির ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন তখন চোখের সম্মুখ হইতে যেন চিরকালের অজ্ঞানের পর্দ্দাটা সরিয়া গেল। জাগতিক ব্যাপারের মূলসূত্রটা যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। এবং কোনও রকমে এই গণিতটা প্রয়োগ করিতে পারিলেই যে সকল বিদ্যাই জ্যোতিষের মত ধ্রুব হইয়া উঠিবে সকলেরই এই স্থির বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসের জের এখনও চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও গত শতাব্দীর প্রথমে যখন তাড়িত ও চুম্বকের অনেক ঘরের কথা

বাহির হইয়া পড়িল তখন আবার জ্ঞানসমুদ্রে একটা ছোটখাট ঢেউ উঠিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মনের বল যে তাড়িতেরই শক্তি ইহা ত এক রকম স্বতঃসিদ্ধই বোঝা গেল, এবং স্ত্রী পুরুষ, জলস্থল, ঠাণ্ডাগরম ইত্যাদি যেখানেই জোড়া বর্ত্তমান সেইখানেই যে চুম্বকের দুই প্রান্তের সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম বিদ্যমান, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কোনও সন্দেহ ছিল না। জর্ম্মাণ পণ্ডিত শেলিং এই চুম্বক বেচারীর উপর একটা ভারী রকমের গোটা দর্শনশাস্ত্রই চাপাইয়া দিলেন। বিজ্ঞ পাঠকের এ রকম ছোট বড় আরও অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়িবে; এবং যদিও খুব ভয়ে ভয়েই বলিতেছি, আমাদের দেশে যে ত্রিগুণ তত্ত্বের চাবী দিয়া সংসারের সকল রহস্যের দুয়ার খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও আলোচ্য বিষয়ের আর একটা উদাহরণ।

সুতরাং আজ যে, সকল শাস্ত্রের আচার্য্যেরাই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। এমন ঘটনা পূর্ব্বেও অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকবার ঘটিবে। বর্ত্তমান যুগের শরীর ও মন বিজ্ঞানের বলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা একদিকে দেখিতেছি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির জ্ঞানের পথে অপূর্ব্ব সফলতা, অন্যদিকে দেখিতেছি কর্ম্মের জগতে তাদের বিস্ময়কর পরিণতি। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরের বিষয় লইয়া যাঁদের কারবার, তাঁরা যে একবার ঐ বিজ্ঞানের পথটা ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। যখন দেখা যাইবে যে ও-পথটা যতই প্রশস্ত হোক্ ওটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই গন্তব্য পথ অন্য বিদ্যাগুলির

নয় তখনি মোড় ফিরিবার কথা মনে আসিবে। যাহাকে ঘাটে যাইতে হইবে সে যদি হাটের পথের সোরগোল দেখিয়া সেই পথেই চলিতে সুরু করে তবে ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব ছাড়া আর কোনও ফল হয় না।

আমাদের নব্য-ইতিহাসের আচার্য্যেরা যে এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া, এই সব গভীর অগভীর কারণে চালিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কেননা আমাদের দেশে এ কথাটা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের মত একেবারে বিলাত হইতে তৈরী মালই আসিয়াছে; এবং ইংরাজী পুঁথির মাড়োয়ারী মহাজন ইহাকে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইতিহাস অনুসন্ধানের সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিকপ্রণালী কথাটার মূলে কোনও বস্তু আছে কিনা সে আলোচনা আমাদের দেশে নিস্প্রয়োজন বা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

(২)

অবান্তর কথা বাদ দিয়া মূল কথা বলিতে গেলে কেবল এই মাত্রই বলিতে হয় যে বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ, প্রকৃতির বিভিন্ন বিজ্ঞানের কাজের প্রণালী ও প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও ধর্ম্মের আবিষ্কার করা। কিন্তু এই কাজ কিছু বিজ্ঞানবিদ্যারই একচেটে নয়। পৃথিবীতে যেদিন হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে, মানুষ যখন বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় বাস করিত সে দিন হইতে কেবল মাত্র দেহ রক্ষার জন্যই মানুষকে অল্প বিস্তর এই কাজে হাত দিতে হইয়াছে। মানুষ যে দিন আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছে সে দিন সে প্রকৃতির এক মহাশক্তি আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিয়াছে।

যে দিন কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে সেদিন ত প্রকৃতির বহু বিভাগের কাজের প্রণালী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কথা এই যে, জীবন যাত্রাটা চালাইবার জন্য মানুষকে তাহার চারিপার্শ্বের প্রকৃতির যে সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, বিজ্ঞানবিদ্যালব্ধ জ্ঞানের সহিত তাহার কোনও জাতগত প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষত্ব তাহার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়। সাধারণ ভাবে ঘরকন্নার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় প্রকৃতির বিশালতার তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিরাট প্রকৃতির সমস্ত অংশের পরিচয় করা। সুদূর নক্ষত্রের গঠন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবীক্ষণদৃশ্য কীটাণুর জীবন ইতিহাস পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে; বিজ্ঞান বিদ্যার লক্ষ্য একবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলের দিকে। এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসে ভূয়োদর্শনের ফলে এই যে জ্ঞান, ইহা সাধারণ জ্ঞান। নির্দ্দিষ্ট পথে নিরূপিত সময়ে সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেমন করিয়া ঋতু-পরিবর্ত্তন হয় সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উপযুক্ত আহার পাইলে শরীর পুষ্ট ও বলশালী হয়, আর আহার অভাবে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয় এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান। জীবদেহে কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে এবং পরিপক্ক অন্নরস কেমন করিয়া জীব-শরীরের ক্ষয়পূরণ ও উপাদান গঠন করে সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। সাংসারিক কাজের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা স্থূল হইলেও চলে। তাহাতে চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজন নাই; বরং সে হিসাব করিতে গেলে সুবিধা না হইয়া অনেক সময়ে কাজ অচল হইয়া উঠিবারই কথা।

কিন্তু বিজ্ঞান চায় সকল জিনিসেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। একটা চারাগাছ যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়ে ইহা সকলেই জানি, ইহা সাধারণ জ্ঞান। গাছটা প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়িতেছে তাহা জানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রচলিত ঘড়ির সময়ের বিভাগ সাংসারিক কাজের জন্য যথেষ্ট; আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রকে কতকগুলি পরীক্ষার জন্য এক সেকেণ্ড সময়কে হাজার ভাগে ভাগ করা যায় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সাংসারিক প্রয়োজনের পরিমাপ যন্ত্র মুদির দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞান বিদ্যার চাই 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'।

যেমন জ্ঞানে তেমনি জ্ঞানের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণে কোনও ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টায় আমরা বর্হিজগতের জ্ঞান লাভ করি সেই ইন্দ্রিয় গুলিই বিজ্ঞানেরও ভরসা। যে ন্যায় ও যুক্তি আমরা প্রতিদিনকার সাংসারিক কাজে ব্যবহার করি সেই ন্যায় ও যুক্তির প্রণালীই বিজ্ঞানেরও একমাত্র সম্বল। এমন কি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আমরা জগৎ সংসারটার যেরূপ কল্পনা করি এবং যে রকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটী তাহার উপরেই ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক জগৎ নির্ম্মাণের চেষ্টা করে। এ বিষয়টী ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ এমন চমৎকার ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তাহার পর আর কাহারও বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রণালী মূলে এক হইলেও বিজ্ঞান যে ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান চায় তাহার জন্য তাকে নানা রকম কৌশল আবিষ্কার করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এই গুলিই সেই কৌশল। ইহার কোনটীর লক্ষ্য

অতিদূর বা অতিসূক্ষ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনা, কোনটীর উদ্দেশ্য এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে তফাৎ করিয়া অন্য অবস্থায় তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা, কোনটীর চেষ্টা যে কাজের নিয়মটা, এমনি ভাল বোঝা যায় না তাকে গণিতের কলে ফেলিয়া আয়ত্ত করা। এই কৌশলগুলিতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিশেষত্ব এবং ইহারাই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু এই বিশেষত্ব অতি বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব। অর্থাৎ যে কাজের জন্য যে কৌশলটীর দরকার সেই কাজ ছাড়া আর অন্য কাজে তাহাকে প্রয়োগ করা বড় চলে না। কারণ এই কৌশলের আকার ও ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানের বিষয় লক্ষ্যের দ্বারা। কাজেই এক বিজ্ঞানের কৌশলকে অন্য বিজ্ঞানে বড় কাজে লাগানো চলে না, এবং একই বিজ্ঞানের এক বিভাগে যে কৌশল চলে অন্য বিভাগে তাহা অনেক সময় অচল। গতি-বিজ্ঞানে যে গণিত দিগ্বিজয়ী, রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না। রসায়ণের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী তাড়িত বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।

কাজেই ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীর যাহা বিশেষত্ব, তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাহিরে নেওয়া চলে না। এই বিশেষত্বের বেশীর ভাগই প্রত্যেক বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র, বিজ্ঞান বিশেষেই বিশেষ ভাবে আবদ্ধ। আর যাহা সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই সাধারণ তাহা মোটেই বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ নয়। তাহা হইতেছে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের প্রণালী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানে ও সাধারণ জ্ঞানে কোনও ভেদ নাই। এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া কোনও লাভ নাই। কেননা এখানে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয়েরই আসন এক জায়গায়।

সুতরাং ঐতিহাসিক যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা বলেন তখন প্রথমেই সন্দেহ হয় যে তাহার কথাটার অর্থ, যুক্তিসঙ্গত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কেবল এইটুকু বলিলে লোকের মনোযোগও যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় না এবং বিষয়টাকেও সে রকম মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের নামের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময় কি যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।

দুই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' আমাদের দেশের নবীন ইতিহাসচর্চ্চার একটী প্রথম ও প্রধান ফল। সেই পুঁথি হইতেই দৃষ্টান্ত তুলিব।

দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে মহীপালদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে মহীপালদেব বাহুবলে সকল বিপক্ষ দল সংগ্রামে নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনেই তাঁহার পিতা বিগ্রহপাল দেবের বিষয় উল্লিখিত আছে যে তিনি সূর্য্য হইতে বিমলকলাময় চন্দ্রের মত উদিত হইয়া ভুবনের তাপ বিদূরিত করিয়াছিলেন। এবং তাহার রণহস্তীগণ প্রচুরপয়ঃ পূর্ব্বদেশ হইতে মলয়োপত্যকার চন্দন বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া হিমালয়ের অধিত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য্য হইতে 'চন্দ্ররূপে উদ্ভূত' বলিয়া এবং তজ্জন্য 'কলাময়'ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা ও গজেন্দ্রগণ (আশ্রয় স্থানাভাবে) নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশিরসংযুক্ত হিমাচলের

অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাখাল বাবু টীকা করিয়াছেন, "মৈত্রের মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২১১ পৃঃ।) এ কোন বিজ্ঞান? মৈত্রের মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুযুক্তিসঙ্গত এবং রসজ্ঞতারও পরিচায়ক বটে এবং তিনিও সেই ভাবেই কথাটা লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান বেচারাকে টানিয়া আনা কেন?

কহ্লন রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের গৌড়ের রাজাকে হত্যার এবং রাজ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য গৌড়পতির ভৃত্যগণের 'পরিহাস কেশব' নামক দেবতার মন্দির অবরোধ ও তাহাদের বীরত্বের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 'গৌড় রাজমালায়' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে এই কাহিনী সম্ভবতঃ অমূলক নয়, কেননা কহ্লন প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং মূলে সত্য না থাকিলে কাশ্মীরে গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনীর কোন জনশ্রুতি থাকিবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ, কহ্লন মিশ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্ব কাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে, প্রচলিত জনশ্রুতি, অবলম্বনেই কহ্লন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কহ্লন কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ বিজয় কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ

করেন নাই। একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক এবং দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে।" তারপর রাখাল বাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদ কর্ত্তা ষ্টাইন সাহেব এ ঘটনাটা "সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১০৭ পৃষ্ঠা) ষ্টাইন সাহেবের মত সত্য হইতে পারে এবং রমাপ্রসাদ বাবুর ভুল হইতে পার, কিন্তু কোন জনশ্রুতির মূলে সত্য আছে কিনা তাহা স্থির করিবার কোন বাঁধা "বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী" নাই। চারিদিক দেখিয়া এ কথাটা বিচার করিতে হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ইহা অল্প বিস্তর মতামতের বিষয়ই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব কিছু নাই। সচরাচর দশজনে একটা কথার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে হইলে যে রকম ভাবে বিচার করে এও ঠিক সেই রকমের বিচার। তারপর সম্ভবতঃ একটু অবান্তর হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে, রাখাল বাবু তাঁহার "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর" যে একটী সূত্রের কথা এখানে বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই অচল। সে সূত্র আর কোনও বিচার না করিয়াই মানিয়া চলিতে হইলে, কি বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সমস্ত ইতিহাস রচনাই বন্ধ করিতে হয়। "বিজ্ঞানসম্মত" হইলেও প্রকৃত পক্ষে ও সূত্রটা কেহ মানিয়া চলে না, এবং প্রয়োজন হইলে রাখাল বাবুও মানেন না। তিব্বতের তারানাথ গোপালদেব গৌড়বাসীর রাজা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, প্রতিদিন একএকজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব

রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" এই রাজপত্নীর গল্প সম্বন্ধে রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, "তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৫০ পৃষ্ঠা)। সুতরাং 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস' যে একই গ্রন্থের একই বিষয়ে এক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে কেবল তাই নয়, একই ছত্রের এক অংশকে উপকথা এবং অন্য অংশকে সত্য বলিয়াও সাব্যস্ত করে।

এইরূপে রাখাল বাবু তাহার সমস্ত গ্রন্থে বহুবার বহুস্থলে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথার অর্থ সাধারণ সুযুক্তিসঙ্গত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত কথা এই যে, যে জাতীয় সত্য, ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার করে, সেই রকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। যে প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া মনে হয় বুঝি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা মানিয়া চলিলেই ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছান যায়। এর চেয়ে ভুলধারণা আর নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা

রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের একদর হইত। কিন্তু প্রতিভাবান ছাড়া ত কেহ ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে না। এ মজুরের দালান গাঁথা নয় যে ইটের উপর ইট বসাইয়া গেলেই হইল। যে উপাদান লইয়া সাধারণ লোকে কিছুই করিতে পারে না, ঐতিহাসিক প্রতিভা যাঁর আছে তিনি তাহা হইতেই সত্যের কল্পনা করিতে পারেন এবং অনুসন্ধানে সেই কল্পনা সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। সব রকম বড় সত্যে পৌঁছিবারই এই পথ। তারপর এও ভুলিলে চলিবে না যে ঐতিহাসিকের আসল কাজ ধ্বংশ করা নয় গড়া। সত্য অনুসন্ধানের একটা অসম্ভব আদর্শ খাড়া করিয়া কিছুই বিশ্বাস করি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেই যে ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া, হাতে ধরা দিবে এমনও বোধ হয় না।

হয় ত উত্তরে শুনিব যে বিজ্ঞানের যেটা লীলাভূমি সেই সাগর পারে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের নিয়ম কানুন কাটা ছাটা হইয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই আইন কানুন যে ঠিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু তাহা হইল সমুদ্র-পারের ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের 'বিজ্ঞান বিজ্ঞান' খেলা। এ খেলার প্রবৃত্তি কেন হয় এ প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং লর্ড অ্যাক্টন বা সীলীর বচন তুলিয়া কোন লাভ নাই।

মানবজাতির মুক্তির জন্য ভগবান তথাগত যে চারটী মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটী এই যে সকল জিনিসই নিজের

লক্ষণে বিশিষ্ট; 'সর্ব্বং সলক্ষণং স্বলক্ষণং'। এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জিনিস এক হয় না। বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধের বাণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

ভাষার কথা।

—:*:—

স্থিতি আর গতি—এ দুটী প্রকৃতির নিয়ম। একজন মনীষী লেখক হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—what it (Buddhism) destroyed no man has been able to restore and what it left no man has been able to destroy. এ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। What she destroys no man can restore and what she leaves no man can destroy, একটা জাতির মধ্যেও প্রকৃতির এই একই খেলা চলছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এই যে লীলা তা একটা জাতির মধ্যে যতটা পরিস্ফুট ততটা আর কোথাও নয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে আমরা চিরকাল প্রকৃতির এই খেলা সুস্পষ্ট দেখতে পাই, তার শিল্পের ভিতরে, কথার ভিতরে, সাহিত্যের ভিতরে। আর সাহিত্যর যে ভাষা সে সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

সাহিত্যের এই ভাষা নিয়ে বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে একটা আন্দোলন ও তর্কবিতর্ক চলছে। একদল কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করতে চাচ্ছেন, অন্যদল লেখ্য ভাষার অর্থাৎ যে ভাষাটা এতদিন চলে আসছে তারই সমর্থনকারী। এই দুই দল আপন আপন মত সমর্থন করতে গিয়ে যে সব যুক্তি উপস্থিত করেন তা

আমরা সব বুঝি বা নাই বুঝি, আমরা একথা বুঝি যে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটবেই। কারণ বাঙ্গালীজাতি বা বাংলা-ভাষা সৃষ্টিছাড়া একটা পদার্থ নয় আর পৃথিবীতে এ যাবৎ সকল ভাষা সম্বন্ধে যে নিয়ম খেটে এসেছে, বাংলা-ভাষা সম্বন্ধেও সে নিয়মের যে ব্যতিক্রম হবে না এই সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। বেদের ভাষা ও কালিদাসের ভাষায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! চসারের ভাষা, সেক্ষপীয়রের ভাষা, ভিক্টোরিয়া যুগের ভাষা, প্রাচীন ও নব্য ফরাসী-ভাষা একটা ক্রম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। বাংলায় রামমোহনের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এই পরিবর্ত্তনের নিয়মেরই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এই পরিবর্ত্তন যে বঙ্কিম পর্য্যন্ত এসে থেমে যাবে, বিশেষতঃ বর্ত্তমানে ঊর্দ্ধগতিশীল বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যে, বঙ্কিমের ভাষাই যে শেষ কথা এ সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই সমীচিন নয়।

কিন্তু পরিবর্ত্তনের বিরোধী একদল চিরকালই আছে। মানুষের দুটী গুণ প্রকৃতিগত—একটী পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যটি নূতনের প্রতি টান। কিন্তু আমরা যে দলের কথা বলছি তাঁদের নূতনের প্রতি টান অপেক্ষা পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রাই অধিক। সুতরাং এঁরা পুরাতনকেই আঁকড়ে ধরে' থাকতে চান। এমন কি বঙ্কিম যখন কটমট পণ্ডিতী বাংলার পরিবর্ত্তে দুর্গেশনন্দিনীতে অপেক্ষাকৃত কথ্য-ভাষার কাছাকাছি ভাষা চালালেন তখনও একদল ছিলেন যাঁরা বঙ্কিমের সে ভাষাকে স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেন নি। কিন্তু আজ যখন সেই পণ্ডিতী বাংলা আর বঙ্কিমের বাংলা তুলনা করে' দেখি তখন তাঁদের, বঙ্কিমের ভাষার বিরুদ্ধে সেই আপত্তি দেখে আশ্চর্য্য বোধ করি। তাঁরা সহজটাকে যে কেন বক্র করে দেখেছিলেন তা আমরা

বুঝেই উঠতে পারি নে। অন্যপক্ষে আবার আর একদল আছেন যাঁদের পুরাতনের উপর শ্রদ্ধার চেয়ে নূতনের উপর টানের মাত্রাই বেশী। এই দুই দলই আপন আপন মত ও ইচ্ছাকে অত্যন্ত একান্ত ক'রে দেখেন। বলা বাহুল্য এই কারণে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত যে সত্য সে সত্যটা এই দুই দলের চিরকাল অগোচরেই থেকে যায়।

এইজন্যেই আমরা বর্ত্তমানের কথ্য-ভাষার ও লেখ্য-ভাষার কোন্‌টার গুণ কি কি, কোনটার দ্বারা কতখানি ভাবপ্রকাশের সুবিধে হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, ক্রমপরিবর্ত্তন যে ভাষার একটা স্বভাব সেই কথাটিই শুধু নির্দ্দেশ কর্‌ছি। ফলতঃ রামমোহনের সময় হ'তে একাল পর্য্যন্ত বাংলা-ভাষার যে আশ্চর্য্যরকম পরিবর্ত্তন হয়েছে তা যিনি বাংলা-সাহিত্যের কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন তিনিই জানেন। অতীতকালে বাংলা-ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে যাঁরা কোন আপত্তি করেন না, তাঁরা যে ভবিষ্যতে এই পরিবর্ত্তনের কেন বিরোধী তা বুঝে ওঠা কঠিন। আর যে কোন কারণ থাকুক না কেন, আমাদের মনে হয় এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তাঁদের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার, যে ভাষা-টির সাথে তাঁদের এতদিনের পরিচয় সেটিকে ছেড়ে দিতে যেন তাঁরা কষ্ট ও অসচ্ছন্দতা বোধ করেন।

কিন্তু এখন যাঁরা কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌বার বিরোধী তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকতে পারেন, যাঁরা বলবেন যে ভাষার পরিবর্ত্তন যদি হয় তবে হোক্, কিন্তু কথ্য-ভাষাকে—বিশেষতঃ কোন প্রদেশ বা জেলাবিশেষের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌বার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি। এঁদের অনেকেই একটা বিশেষ আপত্তি নির্দ্দেশ করেন যে যদি কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যে চালান যায় তবে ত

ঢাকার অধিবাসীও আপনার ভাষায় পুস্তক লিখ্‌তে বসে যাবেন। এই রকমে যদি প্রত্যেক জেলার লোক তার আপন আপন জেলার ভাষায় সাহিত্য রচনা কর্‌তে আরম্ভ করে তবে বাংলা-সাহিত্যের আদ্যশ্রাদ্ধ তো হবেই, বাংলাদেশ বলেও কিছু থাকবে না। এই আপত্তিটী আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সমীচিন বলেই মনে হয় কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করে চিন্তা করে দেখ্‌লে এ ভয় অত্যন্ত অমূলক বলেই সাব্যস্ত হবে।

কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যে চালাতে চেষ্টা কর্‌লে যে ঢাকার অধিবাসী কিম্বা অন্য কোন জেলার অধিবাসী আপন আপন জেলার ভাষায় বই লিখ্‌তে সুরু কর্‌বেন না, তার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, কলিকাতার ভাষায় ইতিমধ্যেই পুস্তক রচিত হয়েছে আর মাসিকপত্রে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঢাকার ভাষায় কোন বই বা রচনা প্রকাশিত হয় নি (রজনী সেনের কয়েকটী ব্যঙ্গ কবিতা ছাড়া)। সে ভাষায় কেউ কিছু রচনা কর্‌বার চেষ্টায় আছেন এমন কথাও শোনা যায় না। আসল কথা এই যে বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর মনের কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার দিকে একটা স্বাভাবিক গতি আছে। এই বাংলাদেশের যে কোন জেলার লোকই হন না কেন শিক্ষিত হ'লেই তিনি নিজের জেলার আন্‌কোরা ভাষা পরিত্যাগ করেন। আর কিছু দিন কলিকাতায় থাক্‌লে তো কথাই নেই। তখন তিনি কলিকাতার ভাষাকেই আপনার ভাষা করে নেন। কলিকাতার ভাষার প্রতি শিক্ষিত মণ্ডলীর এই যে স্বাভাবিক টান তার কারণ যাই হক না, তা সত্য। এই কারণেই ঢাকা বা চট্টগ্রামের ভাষায় লেখা কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে স্থান পায় নাই। আর এই কারণেই নানান্ জেলার নানান্

ভাষায় পুস্তক রচিত হয়ে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হ'বে সে আশঙ্কা একেবারেই অমূলক।

তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঢাকার ভাষাতে বই লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, এমন কি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ও সৃষ্টি করেন, তবে তাহা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পঠিত হবে সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও সে ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌বে কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। ফরাসী কবি মিস্ত্রাল (Mistral) তাঁর প্রাদেশিক ভাষায় প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য মিস্ত্রালের সে কবিতা ফ্রান্সে সর্ব্বত্র পঠিত ও সমাদৃত কিন্তু তাই বলে সে ভাষা ফরাসী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে নি। বার্ণস্ (Burns) স্কচ্ ইংলিশে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন কিন্তু সে ভাষা ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা হয়ে পড়ে নি। কারণ লেখকের যে রকম অমানুষী প্রতিভাই থাকুক না কেন, ভাষারও একটা প্রকৃতি-পরিচালিত স্বকীয় প্রাণ স্বকীয় গতি আছে। আর সাহিত্যের ভাষার যা পরিবর্ত্তন তা ভাষার সেই প্রকৃতি পরিচালিত গতির মধ্য দিয়েই ঘটে, তার বাইরে দিয়ে নয়।

সুতরাং যিনি যে ভাষাতেই সাহিত্যে চালাতে চেষ্টা করুন না কেন তাঁর সে চেষ্টার সফলতা নির্ভর করবে এই জিনিসটির উপর যে সে ভাষা, আমরা ভাষার প্রকৃতি পরিচালিত যে গতি যে পথের কথা বলেছি সেই গতি সেই পথের অনুসরণ করছে কি না? তা যদি না হয়, যদি সে ভাষা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে ভাষা সাহিত্যে কিছুতেই টিঁকে থাক্‌তে পারবে না। বঙ্কিম যদি কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ কমলাকান্ত রামমোহনের ভাষায় লিখতেন তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হ'ক না কেন সে ভাষা পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ত কি না সে বিষয়ে

ঘোর সন্দেহ আছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয় সামগ্রী। কিন্তু মেঘনাদবধের ভাষা বঙ্গ-কাব্যকুঞ্জে আর কারও কণ্ঠে ফুট্‌লো না। তারও ঐ একই কারণ। সুতরাং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌বে কি না, তা নির্ভর করছে কথ্য-ভাষা আর প্রকৃতির টানের যোগাযোগের উপর সে ভাষাটি প্রকৃতি-পরিচালিত গতির অনুকূল কি না তার উপর। কতদূর অনুকূল অথবা কতদূর প্রতিকূল সে বিচার আমরা এখানে করবো না। Fact হিসেবে ত দেখ্‌ছি বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের উপর তার প্রভাব অনেক খানি। এই নবাগত ভাষা বাংলা-সাহিত্যে যাতে পাকা হ'য়ে বস্‌তে পারে, ভবিষ্যৎ বাংলা-সাহিত্যেরই ভাষা হ'য়ে উঠ্‌তে পারে সে জন্য দরকার সেই অমানুষী প্রতিভা অলৌকিক মনীষা, যা সৃষ্টির দ্বারা দেখিয়ে দেবে যে এই ভাষা ভুঁইফোড়ও নয়, বিদ্রোহীও নয়, বাংলা-সাহিত্যের প্রাণের সাথেই এর অব্যর্থ সংযোগ, এ ভাষা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের ভাষারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ভাষা হচ্ছে মন্ত্র। শব্দের মধ্যে ঋষি যেমন তাঁর তপস্যা-শক্তিকে ঢালিয়ে দিয়ে তাকে মন্ত্রে পরিণত করেন তেমনি লেখক তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ভাষা যেন সুপ্তবীণা। বীণার সপ্ত-তন্ত্রীতে সুর রয়েছে, তা যে কোন অঙ্গুলিস্পর্শে নিষ্কণিত হয়ে উঠে। কিন্তু এই সপ্ততন্ত্রীর সপ্তসুরের পশ্চাতে একটী সমগ্র জগৎ বিদ্যমান—মানুষের যে রাগ দ্বেষ হাসি অশ্রু লজ্জা ঘৃণা ভয় মান এই সপ্তসুরের অন্তরালে লুক্কায়িত তা ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই বীণা সাধকের প্রতিভাময় অঙ্গুলির স্পর্শ। আমাদের কথ্য-ভাষা প্রতিদিনের ভাষা। এর যে কি গুণ আছে না আছে তা আমরা ত কিছুই

জানি নে। এ ভাষাকে জ্বলন্ত করতে জীবন্ত করতে চাই প্রতিভার তপস্যা। প্রতিভাবান লেখক নবীন ভাষার শক্তি সৌন্দর্য্য ছন্দ তাল এক কথায় এর latent potentiality ফুটিয়ে তুল্‌বেন। এ ভাষায় প্রতিভাবান লেখক বা লেখকেরা এমন সাহিত্যের সৃষ্টি কর্‌বেন যার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত দেশের উপর ছড়িয়ে পড়্‌বে, তখন কি পাঠক কি লেখক সকলে সে ভাষার প্রতি দুর্ব্বার ভাবে আকৃষ্ট হতে থাক্‌বেন। তাই যখন হবে তখন নূতনের সৌন্দর্য্যে নূতনের তেজে নূতনের শক্তিতে পুরাতনের বিসর্জ্জনের আয়োজন চল্‌তে থাক্‌বে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য।

উপরোক্ত প্রবন্ধের মূল কথাটি আমি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি, এবং মুখের ভাষার যে কালক্রমে পরিবর্ত্তন হয়, আমার বিশ্বাস এ সত্য অদ্যত মুখে কেউ অস্বীকার করেন না। এ সত্ত্বেও যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তার কারণ মুখের ভাষার পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী লেখার ভাষাকেও যে পরিবর্ত্তিত করে' নেওয়া কর্ত্তব্য এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই ত তর্ক ওঠে।

প্রথমতঃ—গতি জিনিসটে দুমুখো। পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকেও হতে পারে, অবনতির দিকেও হতে পারে। পরিবর্ত্তন শব্দ উচ্চারণ করবামাত্র, মানুষের চোখের সুমুখে হ্রাসবৃদ্ধির চেহারা এসে উপস্থিত হয়, এবং কাজেই লোকে না ভেবেচিন্তে হ্রস্বতাকে অবনতির ও বৃদ্ধত্বকে উন্নতির লক্ষণ বলে' মনে করে। যেহেতু তদ্ভব শব্দ প্রায়ই তৎসমের চাইতে আকারে ছোট সে কারণ, অনেকের বিশ্বাস বাংলা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এবং যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্য ভাঙ্গাচোরা বাদ দিয়ে আস্ত জিনিসটেই সাহিত্যের কারবারে লাগানো সুবুদ্ধির কাজ। এ ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য আমাদের বল্‌তে হয়, যে হ্রাসবৃদ্ধি বল্‌তে আমরা বুঝি পরিমাণের তারতম্য, ও হচ্ছে গণিতবিদ্যার হিসেব আয়ুর্ব্বেদের নয়। নচেৎ আমাদের স্বীকার কর্‌তে হয় যে, যে সব জীবের বিরাট কঙ্কাল আমরা যাদুঘরে দেখতে পাই তারা মানুষের চাইতে উন্নত-

স্তরের জীব ছিল। দেহের পরিমাণ থেকে, আত্মার পরিমাণ নির্ণয় করা দূরে থাক্, দেহীর জীবণীশক্তিও যে নির্ণয় করা যায় না, এ জ্ঞান যদি সর্ব্বসাধারণ হত, তাহলে বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর নবীনমত মানুষে দর্শন বলে গ্রাহ্য করত না। দেহাত্মবাদ আজও মানুষের মনের উপর প্রভুত্ব কর্‌ছে সুতরাং তার বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে লড়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের মুখের ভাষার উপর আমাদের হাত নেই, সে ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তন আমরা বন্ধ করতে পারি নে। লক্ষমুখে যে ভাষা গড়ে ওঠে—তার পরিণতি প্রকৃতি-পরিচালিত বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু লেখার ভাষাকে এই পরিবর্ত্তনের হাত থেকে কতকটা বাঁচানো আমাদের করায়ত্ত। তা ছাড়া লেখার ভিতর ভাষাটাকে বেঁধে রাখবার প্রবৃত্তিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মুখের ভাষা বদলায় মানুষের অজ্ঞাতসারে এবং অজানা জিনিস নিয়ে মানুষে কারবার কর্‌তে সহজেই ভয় পায়। সুতরাং লেখায়, সাহিত্যের পূর্ব্বপরিচিত ভাষা ব্যবহার করা, লোকের বিশ্বাস লেখকের পক্ষে নিরাপদ ও সাহিত্যের পক্ষেও শ্রেয়ঃ। মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার একটা যথার্থ প্রভেদও আছে, সে প্রভেদ হচ্ছে এই যে মুখের ভাষা organic এবং লেখার ভাষা organised অর্থাৎ শেষোক্ত ভাষাকে নিজের মনোমত করে গড়ে পিটে নেবার স্বাধীনতা লেখকের অনেক পরিমাণে আছে। Organised জিনিসকে স্থায়ী করা সহজ কেননা ওরূপ বস্তু আপনা হতেই জড়ত্ব লাভ করে, আর সকলেই জানেন যে জড়বস্তু পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন নয়। সাহিত্যের ভাষার এই একভাবে টিকে থাকবার স্বভাবটা অনেকে তার প্রধান গুণ মনে করেন, কিন্তু আমার মতে ঐটেই তার প্রধান দোষ। ভাষা যাতে

সাহিত্যে জমে' না যায়, সে বিষয়ে আমাদের সদাসর্ব্বদা সচেতন ও সতর্ক থাক্‌তে হবে। লেখার ভাষার গতি স্বভাবতই মৃত্যুর দিকে। মুখের ভাষার সংস্রবেই তাকে জিইয়ে রাখা যায়। জীবন্ত ভাষাও লেখকদের হাতে পড়ে' যে কত শীগ্‌গির মৃত ভাষা হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ ভারতবর্ষের একাধিক কেতাবি প্রাকৃত। সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌লে লেখা জিনিসটেও Mechanical হয়ে পড়ে। এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই যা Mechanical তার বিরুদ্ধে লড়া দরকার। মানুষের দেহ মনের সকল কাজ যে কত সহজে Mechanical হয়ে পড়ে, এ জ্ঞান যাঁর আছে তিনি এই লড়ালড়িটে বৃথা কাজ বলে মনে কর্‌বেন না।

আমরা লেখায় সকলকে মুখের ভাষার অনুসরণ কর্‌তে বলি, অনুকরণ কর্‌তে নয়,—তার কারণ লেখার ভাষা মুখের ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। মুখের ভাষা, যে লেখায় দ্বিত্ব লাভ না করে, তা সাহিত্য নয়, এবং বলা বাহুল্য লেখা মাত্রেই সাহিত্য নয়। অধিকারীর হাতে ভাষা পুনর্জ্জন্ম লাভ করে আর অনধিকারীর হাতে মৃত্যু। সুতরাং যাতে আমাদের কলমের স্পর্শে ভাষা মারা না যায় সে বিষয়ে, আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এ বিপদ এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মুখের ভাষার কাছঘেঁসে থাকা।

প্রবন্ধ লেখক মহাশয় ইঙ্গিতে বলেছেন যে নূতনের প্রতি টান বশতঃই আমরা নূতন মত প্রচার করেছি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, নূতনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আমি বাংলা-ভাষার গুণকীর্ত্তন কর্‌তে প্রবৃত্ত হই নি, বাংলা-ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই নূতন মত প্রচার কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। ভাষার রূপগুণ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা

নির্ণয় করা যায় না,—এর জন্যে রুচিও চাই। বাংলা-ভাষার সুর আমার কাণে মিষ্টি লাগে—এবং তার গতির ভিতর আমি অপূর্ব্ব প্রাণের পরিচয় পাই বলেই, দেশসুদ্ধ ভাষাপণ্ডিতে একজোট হয়েও আমার মন থেকে সে—মায়া কাটিয়ে দিতে পারছে না;—কেননা যা প্রত্যক্ষ তা কেউ অপ্রমাণ করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে' আমরা পূর্ব্ব পক্ষের কথা উপেক্ষা করতে পারি নে; এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁদের যুক্তিতর্কও মেনে নিতে পারি নে।.....কাজেই ওঠে তর্ক।

বাংলা-ভাষার যে সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতা আছে, এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরা নিত্যই এ ভাষার নানারূপ ত্রুটি ও দৈন্যের বিষয়ে আমাদের সচেতন করিয়ে দেন। তর্কের খাতিরে আমাদের মাতৃভাষার হীনতার কথা মেনে নিলেও সে ভাষাকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে তিরস্কৃত করবার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাই নে। পৃথিবীর কোন ভাষাই সর্ব্বগুণে গুণান্বিত নয়, এবং তুলনায় সমালোচনা করতে গেলে, ভাষা মাত্রেরই কোন না কোন ত্রুটি ধরা পড়ে! ফরাসী-ভাষায় যে Paradise Lost রচিত হতে পারত না—এ বিষয়ে বোধ হয় ইউরোপে সকলে এক মত, কিন্তু তার জন্য ফরাসী সাহিত্য লাষ্ট ক্লাশে পড়ে যায় নি। অপর পক্ষে Musset-এর Comedies & Proverbs ও ইংরাজি ভাষাতে রচিত হতে পারত না। কিন্তু তার জন্য ইংরাজি সাহিত্যের ও মাথা নীচু হয়ে যায় নি। তা ছাড়া Divina Comedia কি ফরাসী কি ইংরাজি কোন ভাষাতেই রচিত হতে পারত না—কিন্তু তাই বলে ইতালীর সাহিত্য ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। এ সব কথা যদি সত্য হয় তাহলে সংস্কৃতের তুলনায় বাংলা-ভাষা দীনাহীনা, এ কথা বলার কোনই সার্থকতা নেই। আমি স্বীকার করি যে

স্বয়ং কালিদাসও বাংলা-ভাষায় মেঘদূত রচনা করতে পারতেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? বৈষ্ণব পদাবলীও ত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত হতে পারত না। আমার এ কথা যে কতদূর সত্য তা চণ্ডীদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন। পৃথিবীর অপর সকল বস্তুর মত ভাষাও দোষগুণে জড়িত। যে ভাষায় যা নেই তার উপর নয়, যা আছে তার উপরেই সাহিত্য গড়তে হবে। লেখকের পক্ষে ভাষার ত্রুটী নয় তার শক্তিরই সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ও প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন। প্রতিভার অপেক্ষায় বসে' থাকার অর্থ সেই লেখকের জন্য প্রতীক্ষা করা যাঁর হাতে বাংলা-ভাষার সকল শক্তি ফুটে উঠবে। ইতিমধ্যে অবশ্য আমরা হাত গুটিয়ে বসে' থাকতে পারব না;—কেননা প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া না হওয়া অদৃষ্টের কথা। শুধু তাই নয়, প্রতিভার কর্ম্মক্ষেত্রের জমি আগে থাকতেই তৈরি করে রাখতে হয়।

সম্পাদক।

পরমায়ু।

—:০:—

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝর্‌না স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার-ধারা
চল্‌চে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাতির সাতনলী হার, নয় সে নিশাস বায়ু।
নানান্ প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে' আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে' পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দ রসে পুরে;
অতীত হয়ে' তবুও তারা বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই ত যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়

তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে' নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েচি, ডুব দিয়েচি, ঘট ভরেচি, নিয়েচি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

একটি ঘটনা।

——:০:——

সকাল বেলা দোকানে বসিয়া আমরা কয়েকজন বন্ধুতে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিলাম। একটী ছোট ছেলে দরজার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল—একটী পয়সা বাবুজী।

ছেলেটীর বয়স ৭।৮ বৎসর। তার গৌর নধর দেহ ধূলিমলিন; কেশ দীর্ঘ ও ঘন, কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। ভগবান যাহাকে রাজপুত্র সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সমাজ কৌপীন পরাইয়া এই সুকুমার বয়সেই তাহার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি চাপাইয়া দিয়াছে।

একটা গান কর—পয়সা দেব, বলিয়া সুরেশ একটী পয়সা দেখাইল।

গান জানিনে ত বাবু—

নাচতে জানিস্?

না বাবু।

তবে ভাগ্ এখান থেকে।

ছেলেটী কিন্তু চলিয়া গেল না। বয়স অল্প হইলেও ইতিমধ্যেই সে বুঝিয়াছে যে এত অল্পে অভিমান করিলে তাহার চলিবে না। মিনতিপূর্ণ দুটী চক্ষু সুরেশের দিকে তুলিয়া সে আবার বলিল—একটা পয়সা দাও, ও বাবু।

আবদার পেয়েছিস্—ভাগ্ বলিয়া ধমক দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে সুরেশ চা খাইতে লাগিল।

যাহার বয়স আবদার করিবার—আব্দার করা তারও অপরাধ! কে তাহার আবদার শুনিবে! ভিক্ষা যে কেহ দিতে পারে—আবদার ত যে কেহ শুনিতে পারে না।

কেন জানিনা বালক কিন্তু সুরেশের মুখের দিকেই চাহিয়াছিল আর কেহ ত রূঢ় কথাটীও তাহাকে বলে নাই!

পিয়ালা হইতে সুরেশকে মুখ তুলিতে দেখিয়া সে আবার বলিল—একটা—

পিয়ালার অবশিষ্ট গরম চা, সুরেশ বালকের গায় ঢালিয়া দিয়া বলিল—কেমন? ধরেছিস্ ত? নে এইবার—

তাহার সেই অদ্ভুত ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া হরিশ বলিয়া উঠিল—কি বাহাদুরীই হ'ল ওর গায়ে চাটুকু ঢেলে!

নরেন সেই সুরেই আরম্ভ করিল—আহা বেচারী, কোন ত জোর নেই, ওর—

ছেলেটী কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—এও সেই আবদারের সুর। তবে আরো করুণ আরো মর্ম্মস্পর্শী। সে সুর অনেকের প্রাণে বাজিল—পথের পথিক পর্য্যন্ত চকিতে চাহিয়া দেখিল কিন্তু সেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ ভিখারী বালককে দেখিয়া আর কিছু করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

প্রায় নির্ব্বিকার ভাবে পকেট হইতে একটী আনি বাহির করিয়া সুরেশ বালকের গায় ছুড়িয়া দিল। বলিল—চলে যা এখান থেকে চেঁচাস্ নে আর—ও গান আমরা শুনতে চাই নে।

ভয়ে ভয়ে বালক চুপ করিল—তাহার কান্না আর শোনা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল যে সে তখনো ফোঁপাইতেছে। এ ফোঁপানীও

ক্রমে থামিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শেষবার সুরেশ ও আমাদের দিকে চাহিয়া শেষে উঠিয়া গেল।

তাহার চোখের জল তখনো শুকায় নাই কিন্তু ভিক্ষা পাইয়া যে সে কৃতার্থ হইয়াছিল সেই চোখের কোণেই সে কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

ধরতাই বুলি।

—:*:—

এ কথাটা বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাক্‌লেও, কথাটায় যা বোঝায় তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; এবং মানুষে ধরতাই বুলির উপর যে বিশ্বাস খরচ করে, সেটা যদি নিজের জন্যে জমিয়ে রাখ্‌ত তা হলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাক্‌ত না। সত্ত্ব, রজ, তম, সোঽহং প্রভৃতি বচনগুলি যে ছাত্র সমাজে, বৃদ্ধের দলে, মাসিক পত্রিকায় স্বদেশী বক্তৃতায় কতবার আওড়ান হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার ইংরেজী শিক্ষিতের দলে ত ধরতাই বুলি ছাড়া কথাই নেই। রাজভাষার এমনি মজা যে ওর বুক্‌নী শিখলেই সে ভাষায় ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া যায়—শুধু তাই নয় বাঁধিগৎ এর বন্ধনে ভাবের গলায় যে দড়ী পড়ে তাও সম্পূর্ণভাবে ঢাকা যায়। এ সত্যের প্রমাণ খুঁজতে প্রয়াস পেতে হয় না, দৃষ্টান্তের ও অন্ত নেই। যে সব উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা বাংলা লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌লে উত্তর দেন "বাংলা আমি জানিনে" তাঁদের ভিতর শতকরা ৯৯ জন ভদ্রলোক সেই সঙ্গে মনে মনে বলেন "ইংরেজীটা জানি, তাই ধরেই আমার মনের কথাগুলো হুড় হুড় করে বেরুবে, মানুষে একসঙ্গে ক'টা ভাষা শিখতে পারে"। তাঁরা যখন বিদেশী ভাষায় কোন প্রবন্ধ লেখেন তখন মনে হয় "বেশ হল" কিন্তু যখন ঐ প্রবন্ধটা বাংলায় তর্জ্জমা করে পড়ি তখন মনে হয় সাহিত্যের অরন্ধন ভক্ষণ হচ্ছে। বাংলা দলের পক্ষেও ঐ কথাটা খাটে। মাসিকপত্রে সচরাচর যে সব প্রবন্ধ বেরোয় তাদের তর্জ্জমা

করলে মনে হয় "Census report-এর কথাগুলো খাঁটি, দেশে বাস্তবিকই অনেক সন্তান জন্মায়, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা এক আধজন বাঁচে"।

যাই হোক্ মোদ্দা কথাটা এই যে আমরা বুলি গুলো না বুঝে, না বাজিয়ে, মনের উপর তাদের কি রকম প্রভাব তা না জেনে, সে গুলো চালাতে চাই। সাধারণ লোকের হাতে বনমানুষের হাড় যেমন শুধু হাড়ই থেকে যায় তা দিয়ে কোন খেলা দেখান যায় না, তেমনি আমাদের হাতে ইংরেজী সংস্কৃত বুলি গুলো, শুধু বুলিই থেকে যায়—তা দিয়ে জীবনের কোন খেলাই খেলা যায় না। এই যেমন Evolution; যখন Politicsআলোচনা করি (অবশ্য অন্য দেশের) তখন বলি এই প্রজার পরোক্ষভাবে রাজ্য শাসন করবার প্রথাটা হঠাৎ আসে নি, এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে; যখন সমাজ সংস্করণের কথা ওঠে তখনও বলি "আচার কি আর ব্যাঙের ছাতা, যে রাতারাতি ভুঁইফুড়ে উঠেছে, এরও একটা ক্রমবিকাশ আছে" এই রকম বিবাহের, এমন কি ভগবানের ও নাকি Evolution আছে শোনা যায়।

আছে জানি, কিন্তু কি আছে নেড়ে চেড়ে দেখা যাক্। Evolution শব্দের মানে হচ্ছে কর্ম্মফল, যদিও ওর প্রতিশব্দ হচ্ছে অভিব্যক্তি। ধার্ম্মিকের কাছে "কর্ম্মফল" শব্দটা উচ্চারিত হলেই যেমন তাঁর বুদ্ধির আয়নার ঘাম মুছে যায়, তেমনি ইংরেজী পড়া লোকেদের কাছে এই কথাটার মন্ত্রশক্তিতে সকল তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়। ঐ একটি কথার জোরে সকল সমস্যার বাইরে চলে যাওয়া যায়। আমি আমার একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি "ও কথাটার মানে কি বুঝিয়ে

দিতে পার?" তিনি বল্লেন "ভাল করে বুঝতে গেলে অনেক কাঠ খড় চাই—তা তুমি যোগাতে পারবে না, তবে এই দুটো কথা শিখে রাখ survival of the Fittest আর Struggle for Existence"—তাহলেই ওর মোদ্দা কথা শেখা হবে।

"এ, ত কেবল নিয়মগুলো"

"ওই হল, আর কিছু বোঝবার দরকার নেই, বাস্তবিক পক্ষে Evolution বুঝতে আমরা তার নিয়মই বুঝি, কিন্তু আদৎ জিনিসটা সম্বন্ধে আমার খুব সাফ্ ধারণা নেই—বোধ হয় ক্রমবিকাশ বল্লে ভুল হবে না"

"না আমি প্রতিশব্দ চাই না, কথার মানে অভিধানেই দেওয়া আছে, কিসের ক্রম বিকাশ বুঝিয়ে দিতে পার?"

"এই ধর মানুষ, বাঁদরের"

"এই রকম করে কতদূর পিছু হটতে পার?"

"Cells পর্য্যন্ত"

"অর্থাৎ যতদূর অনুবীক্ষণে দেখা যায়; তার বেশী না?"

"এক পা'ও নয়"

"আর, কতদূর এগোতে পার?"

"মানুষ পর্য্যন্ত; তার বেশী এক পা'ও নয়, সব জ্ঞানই ত সীমাবদ্ধ তার উপর আবার বিজ্ঞান, তবে এই মাত্র কথা, অভিব্যক্তি-বাদে বিশ্বাস করতে গেলেই মেনে নিতে হবে যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পূর্ণ বিকাশের লোভে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে—অর্থাৎ উন্নতি করছে"

"ওটা তোমার নিজের কথা—বুকণীর বাইরের কথা। কোন একটা ভাব বুঝতে গেলে তার অভাবের স্বভাব বুঝতে হবে। যেমন 'প্রকা-

শের ব্যাথা' বল্লেই 'অপ্রকাশের আনন্দ' ভাব মনে জাগে। কিন্তু বিজ্ঞানে 'নেতি'র দিক্ হচ্ছে উত্তরায়ণ, সে ধারে কোন কাজ হয় না। শুধু কাজ হয় না তাই নয় ও ধারটা যে আছে তাও তোমরা মানতে রাজী নও, এই বলে উড়িয়ে দিতে চাও যে Struggle হচ্ছে অবিকাশের বিপক্ষে। কিন্তু এ সত্য ভুলে যাও যে, পৃথিবীতে জীবনের বিকাশের বাধার নিয়মাবলীকেও ইভলিউসানের নিয়ম বলা যেতে পারে। আর Involution বলে যে একটা process আছে এও মানতে হবে। তোমরা বল মানি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মান না। আবার আর এক কথা, ওই অভিব্যক্তি আর অনভিব্যক্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে যার নাম হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশ্চলতা। চীন সভ্যতা ৪০০০ বছর আগেও যা ছিল এখনও তা আছে, এ ক্ষেত্রে তোমার ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী কি করে খাটাচ্ছ ?"

"কি জান, আমার মাথায় এ বিষয়ের এ দিক ও দিকের ভাবগুলি তেমন সাজান নেই"

"তা বেশ জানি, তবে আমার মাথাও ঐ বিষয়ে যে বেশী পরিষ্কার তা নয়—যাই হোক্ আমি এই অস্পষ্টতার কারণ দেখাতে পারি"

"দেখিয়ে কোন লাভ নেই, যদি অভিব্যক্তি-বাদের অস্পষ্ট কথা গুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারতে তা হলে কিছু positive জ্ঞান লাভ হত। negative-criticism করা যেমন সোজা, করাও তেমনি বৃথা"

"এও আর একটা বুলি।—আমি কারণ দেখাচ্ছি, আমার মাথা ও তোমার মাথায় যে পরগাছা জন্মেছে তার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে—ফুল-গাছের তোয়াজ মানে তার গায়ে কাগজের ফুল গেঁথে দেওয়া নয়—

তার মাথা মাঝে মাঝে ছেঁটে দেওয়া আর তার গোড়ার মাটি ঢিলে করে দেওয়া। মনের দেশেও ভাবের ফুল ফোটাবার ঐ একই পদ্ধতি।

"হয়েছে, কি বলবার আছে বল দেখি"

"আমার প্রথম আপত্তি—ইংরেজী কথার দাসত্ব জিনিসটেতে। এক একটি বচন যেন জালের কাঠ, জ্ঞানের বন্ধনের অপেক্ষাও এর বাঁধন শক্ত।

দ্বিতীয় কথা এই ঃ—Darwin-এর মত সম্বন্ধে কতক ভুল ধারণাই তাঁর মত বলে চলে যাচ্ছে। তাঁর প্রথম ও শেষ কথা এই যে, জীবদেহে অদ্যাবধি যে বদল ঘটেছে, তারই ইতিহাসের নাম ইভলিউসান। সেটা কখনও Moral thesis হতে পারে না যাতে করে আমরা তার রীতিকে নীতি হিসেবে গণ্য করে মানব জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ইতিহাস দাঁড় করাতে পারি ; অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করলে মনে অনেক দুরূহ প্রশ্ন সম্বন্ধে শান্তি আসে বটে কিন্তু তাই বলে যে সে মতের উপর নির্ভর করে কোনও চেতন পদার্থের বিকাশের সাহায্য হতে পারে এটা বিশ্বাস করি না। তুমি কি মনে কর যে Darwinism সংক্রান্ত কোনই বই পড়িয়ে আমাদের মত নির্জ্জীব জাতিকে সজীব করতে পারা যায় ?

"হাঁ এক হিসেবে পারা যায়, অনবরত "Struggle-এর কথা শুনতে শুনতে যদি মন নড়ে ওঠে"

"কতকটা সত্যি বটে, কিন্তু Darwinism বুঝতে শুধু Struggle for Existence-ই বুঝি কেন ? ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরস্পরের সাহায্য করবার ইচ্ছা তার কত বড় পাতা অধিকার করে রয়েছে তা স্বয়ং Darwin কি Wallace স্বীকার করলেও আমরা স্বীকার করি

নে। এঁদের মধ্যে একজন এক যায়গায় বলছেন "Those commities which included the greatest number of the most sympathetic members would flourish best" এই একটা লাইন দেখলেই মনে হয় যে Darwin হচ্ছেন বিজ্ঞান ধর্ম্মের যীশুখৃষ্ট, অর্থাৎ তার মতের তিনিই শেষ মতাবলম্বী। পূরো সত্যের ইতিহাস হচ্ছে মানুষের জীবন, আর খণ্ড সত্যের ইতিহাস Inquisition, Thirty Years' War আর বর্ত্তমান যুদ্ধ; এ যুদ্ধ ইভলিউসানের ফল নয় ইভলিউসানবাদের ফল। ধরতাই বুলি খণ্ড সত্য, তাই তার গল্পের পাতা রক্ত দিয়ে লেখা; Balance of Power কি Liberty-র গল্প কি জান না?"

"আরও কিছু বলবার আছে না কি?"

"আরও একটি আছে—সেটা বড় শ্রুতিকটু। বাঁধা বুলির প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের বোকামী। আমরা বড় বুদ্ধিমান বলে বড়াই করি—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে আমরা চালাক হলেও বুদ্ধিমান নই। বুদ্ধিমত্তার রাজচিহ্ন হচ্ছে সূক্ষ্মভাব ধারণের সক্ষমতা। আমরা কিন্তু দা-কাটা Facts ছাড়া আর কিছু নিয়ে মনের কারবার করতে পারি নে।

"সে কি! আমাদের দেশে যে উপনিষদ লেখা হয়েছে, আমাদের জীবনই ত একটা abstraction."

"হাঁ লেখা হয়েছে বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়, কেবল তাই নয় উপনিষদ পড়ে কজন লোক খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে?—একথা আমি খুব বড় গলা করে বলতে পারি যে যদিও আমরা বেদান্ত বেদান্ত করে মরি তবু আমরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত; এমন কি কৃষ্ণজ্ঞান ও নই।

বৈষ্ণব গ্রন্থের এত আদর কিন্তু বৈদান্তিক গ্রন্থের আদর নেই কেন? এত সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক হচ্ছে কিন্তু দার্শনিক কৈ? যখনই রবি বাবুর কবিতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি ঋষি কি না এই নিয়ে ওঠে তর্ক—তাঁর কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য যে কোথায় সে কথা কারুর মুখেই শুনি নে; তার কারন কি জান? রবীন্দ্র নাথকে কবি হিসেবে বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই তাঁকে আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করতে বসি। উপর উপর দেখতে মনে হয় সমালোচকের স্থান গ্রন্থকারের অনেক নীচে, কিন্তু আসলে তা নয়।

"হাঁ একটা কথাই আছে Bad authors turn critics."

"ও বচনটাও ধরতাই বুলি আর সেইজন্যেই খণ্ডসত্য; বাস্তবিক পক্ষে সমালোচকের কাজও মনের কাজ, এবং সে কাজেরও যথেষ্ট মর্য্যাদা আছে। তাঁকে যুক্তির সূক্ষ্ম পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়, Ideas নিয়ে লোফালুফি করতে হয়।"

"আর সেইজন্যেই বোধ হয় সাহিত্যের আসরে সমালোচককে Clown কি বিদূষকের মতন দেখায়।"

"কিন্তু তুমি কি জাননা সার্কাসের Clownরাই হচ্ছে পাকা ওস্তাদ।"

"সব কথাত শুনলুম এখন বলতে চাও কি?"

"এতক্ষণে তা যদি না বুঝতে পেরে থাক তা হলে আমার বকাই বৃথা হয়েছে, একটু নিজে ভেবে দেখ—আমাদের মাষ্টার মশায় বলতেন 'ওহে একটু মনের গা ঘামিয়ো তা হলে কপালের ঘাম পায়ে

পড়বে না।' আমরা যাকে বোকামি বলি তা মনের আলস্যেমি ছাড়া আর কিছু নয়।

"কিন্তু উপদেশটি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন অধার্ম্মিকের, আমাদের ধর্ম্মে, সর্ব্বদা মনকে শান্ত করতে বলে আর সেইজন্যে—

"শান্তিতে শুধু থাকিবারে চাই
একটি নিভৃত কোণে।"

"তোমার শান্তির মানে জানি। মনের কুঁড়েমীকে অন্য নাম ধরে ডেক না, তাহলে সে উত্তর দেবে না। কিম্বা বুলিগুলোকে অত যত্নের মতন মনের প্রহরী করে রেখোনা; যত্নের ধন কেউ নিতে পারে না বটে, কিন্তু সুদে বাড়ে না।"

"তোমার মতে ত ইভলিউসানও একটা বুলি। কিন্তু এটা কি জানোনা যে একালে ইভলিউসান বাদ দিয়ে আমরা চিন্তাই করতে পারি নে।"

"তাজানি, সেইজন্যেই ভবিষ্যতে আমাদের ইভলিউসানের বাইরেই চিন্তা করতে হবে, নচেৎ পৃথিবীর ছোটবড় অনেক সত্য, আমাদের মনের বাইরে থেকে যাবে।"

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

টী-পার্টি।

—:*:—

ব্যক্তিগণ :—

অক্ষয়	...	হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার; Chicago-ফেরৎ।
ভূপেন্দ্র	...	সঙ্গতিপন্ন সাহিত্যিক।
সত্যব্রত	...	বিজ্ঞানে পণ্ডিত।
হিমাংশু	...	ব্যারিষ্টার।
পুণ্ডরীকাক্ষ	...	Antiquarian।
দেবকুমার	...	বেকার ও সব্‌জান্তা।

স্থান :—ভূপেন্দ্র বাবুর বাসভবন।

দে। (চা খেতে খেতে) আচ্ছা, আপনারা কি বলেন? চাটী বেশ উপাদেয় হয়েচে না?

পু। খাসা লাগ্‌চে, ডার্জিলিং চায়ের মতন flavour।

ভূ। তাই বটে। এখানে দোকানে যে সব চা বিক্রী হয় তার চাইতে ভাল মনে হ'ল বলে খাস্ ডার্জিলিং থেকে সেদিন দশ পাউণ্ড নিয়ে এলুম।

পু। সখও ত মন্দ নয়! চা আন্‌বার জন্যেই অতদূর গেছলেন নাকি?

ভূ। না, ততটা নেশা ধরে নি। বেড়াতেই গেছলুম; আসবার সময় খানিকটে চা সঙ্গে আনা গেল।

হি। মজা দেখেছেন? এই চা ই আবার ডাজিলিঙে তৈরী কর্‌লে এখানকার মতন এত ভাল হয় না।

ভূ। বড্ড শীত কিনা।

স। এবার ওখানে খুব শীত পড়েছিল, না?

পু। কোন্ বারই বা কম পড়ে?

স। ওইটে আপনাদের ভুল বিশ্বাস। খবরের কাগজে যে Meteorological report দেয় সেটা কি সম্পূর্ণ বাজে?

দে। তা না হয় মানা গেল যে খুব শীত হয়েছিল, আপনার গায়ে ত আর লাগে নি?

হি। ও আর শীত কি? বিলেতে অমন সময় বরফ পড়ে।

অ। তেমন শীত আমাদের দেশে না হওয়াই ভাল।

হি। কিসে ভাল? এদেশটা যদি আর একটু ঠাণ্ডা হ'ত তাহলে বাঙালীরা এত কুঁড়ে হয়ে যেত না।

অ। মানে বুঝচেন না, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যদিচ বেশী খাট্‌তে পারে, তাদের মধ্যে lungs-এর অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশী।

ভূ। তা আপনার মতন ডাক্তার থাক্‌লে অসুখের বড় ভয় থাকে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মস্ত গুণ হচ্চে, তার দ্বারা রোগের উপশম হোক্ না হোক্ রোগের বৃদ্ধি হয় না।

অ। কি জানেন, য়্যালোপ্যাথীতে সবই অন্ধকারে ঢিল মারা। দেখবেন, আর বিশ বৎসরের মধ্যে ওদের কেবল Surgery-টুকু থাকবে; আর ওষুধপত্র সব হোমিওপ্যাথিক হয়ে যাবে। এই এখনই দেখুন না, Injectionটা আমাদেরই "বিষে বিষক্ষয়" principle-এর

ওপর base করা। ওঁরা ওষুধ ফুঁড়ে দেন, আমরা গিলিয়ে দিই, এই যা তফাৎ।

দে। অনেকে আবার mixed treatmentও করেন। এই সেদিন আমার এক বন্ধুর গা-হাত-পা কাম্‌ড়ে জ্বর এল; একটী ডাক্তার —নাম কর্‌ব না—এক ফোঁটা Aconite ও একটী Aspirin-এর বড়ির ব্যবস্থা কর্‌লেন। জ্বর ছাড়্‌লে দিনকতক রোজ সকালে এক মোড়া করে মকরধ্বজ মধু দিয়ে মেড়ে খেতেও বলে গেলেন।

অ। তাঁর বোধ হয় কোনটাতেই বিশ্বাস নেই। অথবা জান্‌তেন না যে একটী ফোঁটা Rhus Tox 30th. দিলেই হ্যাঙ্গাম মিটে যেত।

হি। আঃ, কি মিছে বাজে বক্‌চেন? চা খাবার সময় অসুখ ওষুধের গল্প করে মন খারাপ কর্‌বার দরকার কি? বিলেতে কোন পার্টিতে ও রকম গল্প করাটা বেয়াদবি বলেই গণ্য হয়।

দে। সেটা ঠিক্। বিলেত, অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেই মুসলমানদের ভিতর ওসব বলবার যো নেই।

পু। হ্যাঁ, মুসলমানেরা সবেতেই কায়দাদোরস্ত।

ভূ। তার মানে, ওদের জাতটা ত বেশী দিন পূর্ব্বে স্বাধীনতা হারায় নি; সুতরাং কায়দা কানুনও বোঝে, virilityও আমাদের চেয়ে বেশী আছে।

স। সে আবার কতকটা আহারের গুণেও বটে। এই ধরুন না মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, এই সব খাওয়ার রেওয়াজ আজকালকার হিঁদুর ছেলেদের মধ্যেও হয়েচে, আর তাতে করে তাদের শরীরও ভাল হচ্চে।

পু। ও বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওসব গরম জিনিস খাওয়া যদি ভাল হ'ত তাহলে কি আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ থাকৃত? কি বলেন, অক্ষয় বাবু?

ভূ। অক্ষয় বাবু 'হ্যাঁ'ই বলুন আর 'না'ই বলুন, যা চলে গেছে তার ত আর চারা নেই? আর ঐ শাস্ত্র দেখিয়ে দেখিয়েই ত আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল।

হি। You're quite right—ঠিক্ বলেচেন। ইংরেজরা অত বড় জাত কেন জানেন? ওরা কখ্খন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কথা কয় না।

স। কখ্খন না। ওরা গতানুগতিকের দাস হলে কি Science জিনিসটা তৈরী হ'ত? ওদেরই ঘরে ত বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর আজ এত বড় হয়েচে'।

পু। তা কিন্তু আপনি বল্‌তে পারেন না। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে aeroplane, machine-gun, asphyxiating gas, barbed wire entanglements, সবই এদেশে জানা ছিল। এখন আর পুষ্পক রথ, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, নাগপাশ, এ সব কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কৌটিল্য পড়্‌লে জানা যায় প্রাচীন ভারতে যে রকম গুপ্তচরের বন্দোবস্ত ছিল তা থেকে জর্ম্মাণরাও spy-system কিছু শিখ্‌তে পার্‌ত। এমন কি আর্য্যেরা wireless telegraphy জান্‌তেন এও প্রমাণ করা যায়।

ভূ। না; ততটা বোধ হয় সহজে প্রমাণ কর্‌তে পারেন না।

পু। সে আর শক্তটা কি? মুনি-ঋষিরা তপস্যাবলে বর পেতেন যে তাঁরা অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর্‌লেই তাঁর "টনক্" নড়্‌বে, আর

তিনি এসে হাজির হবেন। এর থেকেই প্রমাণ হচ্চে যে telegraphy ছিল। এবং যখন পুরাকালের কোন wire খুঁজে পাওয়া যায় নি, তখন নিশ্চয়ই telegraphy টা wireless ছিল।

স। হ্যাঁ, এ যুক্তিটী আপনার অকাট্য! কিন্তু আমি যতগুলো telegraphyর ওপর বই পড়েচি তাতে একবারও এ কথা বলা নেই। অন্তত Hertz বা Marconiরও ত স্বীকার করা উচিত ছিল।

দে। বোধ হয় অতটা তাঁরা খবর রাখ্‌তেন না!

পু। তা ওরা জান্‌লেও কখন স্বীকার কর্‌তে চায় না। ওদের যে-কোন একটা ইতিহাসের বই খুলে দেখুন, লেখা আছে যে ইউরোপে যা কিছু ভাল ব্যবস্থা বর্ত্তমান,—সে কি সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি স্থপতি-বিদ্যায়, কি ভাস্কর্য্যে,—সবই গোড়ায় গ্রীস্ হ'তে আমদানী হয়েছিল। অথচ গ্রীস্ যে এখান থেকে, পারস্যদেশ থেকে, কত কি ধার করেচে তার ইয়ত্তা নেই। এমন কি, বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরাও প্রমাণ কর্‌তে ব্যতিব্যস্ত যে ভারতবর্ষে যা কিছু আছে তা সবই বিদেশী,—মায় মানুষ-গুলো পর্য্যন্ত।

ভূ। এই হাল্-ফিল্ এক ধুয়ো উঠেচে যে পাটলীপুত্রে অশোকের যে শতস্তম্ভ দরবার-ঘর মাটীর নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েচে সেটা নাকি Darius-এর Hall of a Hundred Pillars-এর হুবহু অনুকরণ। অতএব, অশোক পার্সী ছিলেন!

স। কোন্ দিন হয়ত শুন্‌ব যে বুদ্ধদেব চীনেম্যান্ ছিলেন!

পু। কথাটা একেবারে আজগুবি ঠাওরাবেন না। যত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায় তার অধিকাংশেরই চোখ ছোট, কপাল উঁচু, নাক খাঁদা,—

আর গোঁফ নেই। যদিচ, বোধিসত্ত্বগুলোর গোঁফ আছে। এই থেকে ধরা যায় যে বুদ্ধদেব Mongolian raceএ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দে। তার কারণ এও হতে পারে যে China, Japan, Burma Siam এতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার। সুতরাং যাঁরা বুদ্ধমূর্ত্তিগুলো বেশীভাগ গড়েন তাঁরা নিজেদের নাক-চোখকে আদর্শ ভেবে সিদ্ধার্থের প্রতি ভক্তি বশতঃ তাঁকে নিজেদের মতন করেই গড়েন।

ভূ। হ্যাঁ, Mongolian artএ ওদের নিজেদের আকৃতি প্রকৃতি একটু বেশী প্রকট। Mongolian-দের আর একটা ব্যাপার দেখ্‌বেন, তাদের ঘরের প্রত্যেক জিনিসটীতে সৌন্দর্য্যবোধের ছাপ আছে।

পু। সৌন্দর্য্য বোধ আমাদেরই বা কম কিসে? ওরা art শিখ্‌লে কোত্থেকে? Mongolians-দের মধ্যে জাপানীরাই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? সেই জাপান ত গোড়ায় ছিল একটী বাংলা উপনিবেশ মাত্র।

দে। Okakuraও স্বীকার করেচেন যে জাপানীদের আর্ট ভারতবর্ষ হ'তেই প্রাপ্ত।

ভূ। সে রকম ধরতে গেলে সব দেশই এদেশের কাছে ঋণী, এবং আমরাও অন্য দেশের কাছে ঋণী, আর আজকাল ঋণের ভার আমাদেরই বাড়্‌চে।

পু। আপনার কেবল ঐ এক কথা! আজই যেন আমাদের কিছু নেই,—ইউরোপের কাছে ধার কর্‌চি। যখন ওরা বল্কল পরে বেড়াত আর বনের পশু স্বীকার করে খেত তখন এদেশের লোকেরা কত সভ্য ছিল, সে কথা যে একেবারেই ভুলে যাচ্চেন!

হি। কি ছিল না ছিল তা জেনে কি হবে? বরং কি আছে সেইটেরই ওপর নজর রাখা উচিত।

দে। ঠিক্ কথা। আমারও ত পূর্ব্বপুরুষদের জমিদারীর আয় যথেষ্ট ছিল। এখন কি তা আছে? তাঁদের বড়মানুষীর কথা এখন গল্প-কথার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েচে।

হি। আচ্ছা, আপনাদের গেল কি করে?

দে। সে আর বলে কি হবে? দুঃখ বাড়্‌বে বৈ ত আর কম্‌বে না। আমাদের তিনশ বছরের জমিদারী। দশ-শালা বন্দোবস্তের সময় আমার প্রপিতামহ হরকিঙ্কর, কোম্পানীর দেওয়ানকে ঘুস দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর জমিদারীর সদর খাজনা দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর ক্রমাগত ভাগ হয়ে হয়ে এখন গেরস্ত দাঁড়িয়ে গিয়েচি। তাই ত বল্‌চি, পূর্ব্ব-গৌরবের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

স। বেশ, না হয় তাই বিচার করা যাক্ না, যে কি আছে।

ভূ। আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ব্বসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ দুটী জিনিস বজায় আছে,—the art of cooking and the art of music। এই দুই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাবধি আমাদের সমকক্ষ হতে পারে নি।

দে। ও দুটী art এর কথা এক নিশ্বাসে বলা কিন্তু inartistic হল। সে দিন যেমন এক ভদ্রলোক লেক্‌চার দিলেন, poetry and Zoology'র ওপর!

ভূ। আমি ইচ্ছে করেই বলেচি;—আমার রাঁধবার সখ আছে, কেবল তাই জন্যেই নয়। কোন দেশের যখন অধঃপতন হয় তখন সব যেতে পারে কিন্তু খাওয়া থেকে যায়। যেমন কোন লোকের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে গেলেও বসতবাড়ীটী যেতে বিলম্ব হয়।

তবে হিন্দুদের সঙ্গীতটা কেন এখনও বজায় আছে তার ঠিক কারণ আমি খুঁজে পাই নি। বোধ হয়, মুসলমান রাজাদের পেয়ারে।

হি। তাই সম্ভব। দেশের রাজা ও দেশের বড় লোকেরা যদি পেয়ার না করেন ত কোন art-এরই উন্নতি হয় না।

ভূ। তাছাড়া মোগল সম্রাটেরা আবার art-এর দিকে বেশী নজর রাখ্‌তেন।

দে। সব art-এর নয়! Architecture-এই তাঁরা যা কিছু উন্নতি করেছিলেন। ও জিনিসটা পূর্ব্বে আমাদের দেশে তত জানা ছিল না। অর্থাৎ সাজাহান বাদসা যে রকম taste দেখিয়ে গেছেন তার পূর্ব্বে হিন্দুদের ত ওরকম ছিলই না, মুসলমানদের আমলেই কতকটা পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র।

পু। তাজ-টাজের কথা বল্‌চেন ত? সেও আজকাল সকলে স্বীকার করেন না। Havell সাহেব স্পষ্টই প্রমাণ করে দিয়েচেন সে তাজের architecture পুরোদস্তর বৌদ্ধ।

হি। Cooking, music, architecture সবেরই উপর ত বক্তৃতা হল; কিন্তু বাঙ্গলার যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস, literature, সেইটাই বাদ পড়্‌ল কেন? রবিবাবুর গুটিকতক কবিতার অনুবাদ পড়ে যে সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হয়ে গেল এও ত বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভূপেন্দ্র বাবুর এবিষয়ে কিছু বলা উচিত ছিল।

ভূ। দেখুন, সাহিত্যের—সে গদ্যই হোক্ আর পদ্যই হোক্, দুটো দিক্; form এবং spirit। অনুবাদে form থাকে না; কিন্তু spirit অনেকটা থাকে। Wickland যখন Shakspere-এর জর্ম্মণ অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন সেইটে পড়েই Goethe বলেছিলেন যে,

যার গদ্য-অনুবাদ এত সুন্দর তার মূল কাব্য নিশ্চয়ই অতি উঁচুদরের; কেননা অনুবাদে মূলের সে শব্দ বৈচিত্র্য নেই যা মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। রবিবাবুর অনুবাদ পড়ে সব দেশের লোকেরাই মুগ্ধ হয়েচে, এর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে যে ওঁর কাব্যের Spirit সার্ব্বজনীন। সেই Spirit টাই আর্টিষ্টের নিজস্ব, এবং তার জন্যে আর্টিষ্ট পূর্ব্ব-সভ্যতার কাছে ঋণী নন্। তাই সাহিত্যকে বাদ দিচ্ছিলুম।

হি। কিন্তু Goethe-র সময়ে আর্টিষ্টরা যেরকম জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ না রেখে থাক্‌তে পার্‌তেন, Ibsen, Maetertinck, Bernard Shaw-র সময়ে ততটা পারা সম্ভব নয়। তাঁরা Spirit of the age এর স্রোতে গা ঢেলে দিতে বাধ্য হলেন।

ভূ। এবং সেই জন্যেই তাঁরা উচ্চসাহিত্য গড়্‌তে পারলেন না।

পু। গড়্‌লেই বা কি লাভ হত? ওসব করে কি জাত বড় হতে পারে? নাটক পড়ার চেয়ে পাঁচখানা অঙ্ক dynasty'র ওপর বই পড়লে কাজ হয়। আমাদের হয়েছে কি, Nova Zemblaয় কত ডিগ্রী ঠাণ্ডা তা জানি, William the Conqueror থেকে ইংলণ্ডে যতগুলি রাজা হয়ে গেছেন তাঁদের নাম মুখস্থ বল্‌তে পারি, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের date কি তা নিয়ে যুক্তি বিচার করে দেখি না।

হি। তা বটে। আমাদের যা শিক্ষা হচ্চে তা যে একদেশদর্শী তার আর সন্দেহ নেই।

ভূ। মাফ্ করবেন, কিন্তু সেটার জন্যে আপনারাও অনেক পরিমাণে দায়ী। এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গেলেন, আর শিখ্‌লেন কি না ল'! দ্বারিক মিত্তির, রমেশ মিত্তির, স্যর্ রাসবিহারী, স্যর্ আশুতোষ, এঁরা এইখান থেকেই যা আইন শিখেচেন ও লোককে

শিখিয়েচেন তার চেয়ে কি আইনজ্ঞান আপনার বেশী হয়েচে? ল' পড়্‌তে বিলেত যাওয়া national economy নয়। আইনের ব্যবসাটীও national point of view থেকে অর্থকরী নয়। কেবল একজনের ট্যাঁক হাল্‌কা করে আর একজনের ট্যাঁক ভারি করা।

হি। কিন্তু এক হিসেবে আমরা দেশের উপকার কচ্চি। ধরুন, যদি আমরা ব্যারিষ্টার না হতুম ত যে টাকাগুলো আমরা পাচ্চি তা ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের পকেটে যেত।

স। তথাপি, যদি ব্যারিষ্টারী না পড়ে কিছু Science শিখতেন তাহলে দেশের আরও বেশী টাকা বাঁচাতে পারতেন। দেশে যত উকীল ব্যারিষ্টার হয় ততই লোকেরা মামলাবাজ হয়ে ওঠে।

হি। কিম্বা দেশের লোকেরা যত বেশী মামলাবাজ হয়ে ওঠে ততই উকীল ব্যারিষ্টারের দরকার হয়!

ভূ। ও বিষয়ে এমন কিছু statistics নেই যা আশ্রয় করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানরত্ন উদ্ধার করবার জন্যে যে সমুদ্র-মন্থন প্রয়োজন একথা অস্বীকার করা যায় না। বিলেতে না গেলে কি আর জগদীশ অত বড় লোক হতে পারতেন?—গাছের ভাষা মানুষের বোধগম্য হত?

দে। ওটা আমি মানি না। গাছের জীবন আছে এ আইডিয়াটার জন্যে সাগর পারে যেতে হয় নি।

হি। কেবল idea পেলে কি হবে? আইডিয়াকে কার্য্যে পরিণত করতে হলে—বিশেষতঃ Scienceএ,—ঘরের কোণে বসে থাকলে চল্‌বে না।

অ। এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়ে আরো বেশী রকম খাটে।

পু। কেন, আয়ুর্ব্বেদ ত চতুর্ব্বেদের উপসংহার বলে স্বীকৃত হয়েচে। আজকাল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ হলে মহামহোপাধ্যায় উপাধিও মেলে।

অ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কবিরাজেরা নিজেদের মনগড়া "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ" "আমরাক্ষসী" ইত্যাদি নামকরণে বিরত হচ্চেন, ততদন আয়ুর্ব্বেদকে Science ব'লেই মনে হবে না। কি বলেন, সত্যব্রত বাবু?

স। সে কথা সত্যি। তা ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান যেটাকে আজ সত্য বলে মেনে নিচ্চে, কাল যদি সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়, বিজ্ঞান সেটা মিথ্যা স্বীকার করতে বাধ্য। আয়ুর্ব্বেদে কতদিন আগেকার ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েচে, সে ধারণাগুলো একবার revise করে দেখে, এমন লোকও এখানে নেই।

ভূ। অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা পূর্ব্বমত সংশোধন করতে গিয়ে শুদ্ধটাকে অশুদ্ধ করে ফেলি। এই যা বলছিলুম, art of cooking আর art of music-এ জগতে আমাদের তুলনা নেই। রান্নার রীতি বা গানের পদ্ধতিতে আমরা যদি কোন আধুনিক সভ্য দেশকে অনুকরণ করতুম তাহলে মোচার ঘণ্টও খেতে পেতুম না, আর ভৈরবীর মিষ্টি আলাপও শুনতে পেতুম না।

দে। অনুকরণ যে ঐ দুই বিষয়ে করি না, তাও বল্‌তে পারেন না। এই যে এখানে বসে চা, কেক্ বিস্কুট খাচ্চি, এটা কি স্বদেশী ব্যাপার? আর সবচেয়ে ভাল যে স্বদেশী গান—ধন ধান্য পুষ্পে ভরা.....তার সুরটী ত শুনতে পাই সম্পূর্ণ বিদেশী।

হি। ওরকম আমাদের সবেতেই একটু আধটু সাহেবিয়ানা ঢুকেচে। এবং ঢোকাও ভাল। এই বাংলা গদ্য যা এত চমৎকার তা কবে থেকে হল ?—যবে ইংরেজরা আমাদের রাজা হলেন, আর বাংলা গদ্যলেখকেরা ইংরিজী সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করলেন।

ভু। অবশ্য historically তাই বটে, কিন্তু এখন আর গদ্যে ইংরিজীর নকল করা উচিত নয়। বরং যদি নকল করতে হয় ত ফরাসী গদ্যকেই আদর্শ করা সমীচিন। ইংরিজী prose styleটে একটু ভারী। অধিকন্তু বাংলা ভাষা আর বাঙালী মেজাজের সঙ্গে ফরাসী ভাষা ও ফরাসী মেজাজের যেন বড্ড মিল।

দে। Lord Dyttonও বলেছিলেন,—The Bengalis are the French of Asia। বড় চারটীখানি কথা নয়!

স। কিন্তু ফরাসীদের যে রকম অগ্নিপরীক্ষা চলেচে, ওরা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না তারই বা ঠিকানা কি ?

ভু। তাহলে আধুনিক সভ্যতারও সহমরণ হবে। ইউরোপে সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, প্রাচীনকালে গ্রীস্, মধ্যযুগে ইতালী, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স।

স। আর জর্ম্মণি ?

ভু। জর্ম্মণি ত এখন আত্মবিস্মৃত। "জ্ঞানাঞ্জনে তার নয়ন আঁধার।" সমগ্র পৃথিবী আজ তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত,—তার গর্ব্ব খর্ব্ব করতে উদ্যত।

স। কিন্তু Science ওদের মতন কারও নেই।

ভু। একজন ফরাসী থাকলে জবাব দিত যে ওদের Conscienceও অনন্যসাধারণ।

দে। এখন ওঠা যাক্। আমরা যে রকম omniscient ভাবে কথাবার্ত্তা কইচি তাতে ভুলে গেলে চল্‌বে না যে ঘুমোবার সময় হয়ে এল।

দোলপূর্ণিমা ১৩২৩।

শ্রীহারিতকৃষ্ণ দেব।

তপস্বিনী।

—:—

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশ গাছের পাতাটা পর্য্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথাধরার বেদনার মত দবদব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুর-ঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তারপরে বিদ্যারত্ন মশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাৎ থাকে—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প! নামের সঙ্গে মাখন বাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড় শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বিএ পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি

সোঁথীন। জীবন-নিকুঞ্জের মধু সঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড় আশা করিয়াছিল বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলে পণ্ডিত মশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাহুল্য সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিত মশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাষ্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড় বড় দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষা-সাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন সব নামজাদা মাষ্টার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি-লাভের জন্য বড় বড় তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা—কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃসহ। সেকালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্ম্মারা; তারা বরদাকে বড় জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা

হইল এই যে, সে যশস্বী মাষ্টার মশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখন বাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর একদল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে বেতন ত তাঁরা পাইবেনই তারপরে বরদা যদি ফার্ষ্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট হল পর্য্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মত এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে তৃতীয় বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরো বেশী করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মত ভয় করিত তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল "এখানে থাক্‌লে আমার পড়াশুনো হবে না।" মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?" সে বলিল, "বিলাতে।" মাখন

তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড় একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বিএ পাস করা চাই।

এও ত বড় মুস্কিল! বিএ পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বিএ পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বিএ পাস বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, নড়িতে চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কি? তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বিএ পাসে লাগিয়াছেন?

খুব একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বারবার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ। আর একবার পেন্সিলের দাগ দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি? স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয় কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কি কৈফিয়ৎ দিবে?

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায়

আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর একটা পথ খোলা আছে যেটা বিএ পাসের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তারপর একদিন দেখা গেল স্কুল ঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো পরীক্ষা দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা—তাহাতে লেখা "আমি সন্ন্যাসী—আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দ স্বামী"

মাখন বাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে—আর সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের দাগে মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এটলাসের মলাট পাতা; একধারে একটা শূন্য প্যাকবাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাটছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগডেন

কোম্পানির সিগারেটবাক্সবাহিনী বিলাতী নটীদের মূর্ত্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্যে এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের ত এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুর বাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্য্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্না—কর্ত্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন কি মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর, বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এবাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে সে বেশী দিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন, তখন অন্তর্য্যামী বুঝিতেন ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, দাদা কেন যে এত মাষ্টার পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা ত বুঝিনে, লিখে পড়ে দিতে পারি বরদা কখনই পাস করতে পারবে না। পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল

কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথম বার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন, "ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও ত শেখে!" তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব প্রথমের চেয়েও আরো আরো আরো অনেক বড় হইয়া পাস করে—এত বড়, যে স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন, এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মত আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, "ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই ওদিকে আছে।" লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড় আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাটাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া-যাওটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, "এই দেখ না, এল বলে'!" ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, "কখ্খনো না! ঠাকুর লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায় হায় করতে হয়!"

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন—তার কামনা সফল হইল।

এক মাস গেল বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারো মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘসঞ্চার দেখা যায় পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে, আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে। এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন, ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ সুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে সুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে কিন্তু মানুষটি বড় ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল, ততই তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, এমন কি, সে যে তামাকটা পর্য্যন্ত খাইত না এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই ত তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কি ছিল? টাকার ত অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা সোনার টুক্‌রো

ছেলে।" তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারশুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বৌমা যাতে সুখে থাকে মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড় ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন-কিছু ফরমাস্ করে যেটা দুর্লভ—অনেকটা কষ্ট করিয়া লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুসি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন,—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মত হইতে পারে।

(২)

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারদিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিংটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আলমারিটা—তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে, সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার "ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর।"

একদিন যখন বেলা দশটা; অন্তঃপুরে যখন বাটি বারকোস ধামা চুপড়ি শিলনোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকরনার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জালনার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্ত্র মীড়টানা বীণার তারের মত চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগের আয়োজন কর।

এই সুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আব্দারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালো রকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখন বাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতে-ছিল কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্ম্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয় মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কি! বিশেষতঃ জটাধারীরা যখন আহার আরামের অপরিহার্য্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত।

এই সাবধানতার কারণ ছিল এই—পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে! কেননা কি জানি!— বরদার যে-ফোটোগ্রাফ খানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফ দাড়ি জটাজূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কি রকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায় কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্য রকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সাংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়,—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, কাল হয়ত আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে, এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন, তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্ত্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তা'র সত্ত্ব, তেজঃপুঞ্জ তা'র দেহ, গভীর তা'র জ্ঞান, অতিকঠোর তা'র ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার? সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই ত পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার

শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই ত আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড় অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, একবেলা যা খায় তার মধ্যে ফল মূলই বেশী। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধ্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া সুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না—পণ্ডিত মশায় বলিলেন, এ'কেই বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা।

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী-স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্ব্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল,—এমন কি স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রং ত তার গায়ের তসরের রঙের মত সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহ মনের উপর কোন্ একজনের কাণে কাণে কথার মত আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতে-

ছিল জানালার কাছে বসিয়া, তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে; রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিত মশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালী খস্‌খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চীলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুর পাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে ত কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ—পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্ম্মুখের বেদবেদান্ত উচ্চারণের অনেক পূর্ব্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে তারই ছোটবড় হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী ত কৃচ্ছ্র-সাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজো সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রংকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিত মশায়কে ধরিয়া পড়িল আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন। পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার ত এ সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি ত পাকা আমলকীর মত আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারিদিকে লোকে বিস্ময়

প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল বাড়ির ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে একথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে। তাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বল ত?

মাখন বলিলেন, সেটা না শিখিলেও ত বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যতদূরে গেছ সেই খানেই তোমার নাগাল ক'জন লোকে পায়?

তা হউক্ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এম্‌নি দুর্দ্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালীই মোটামুটি তাঁরই মত—অর্থাৎ খায়দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলা দেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোর বেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখী হইয়া দেখা দিলেন। পাখীর ল্যাজে তিনটি মাত্র পালক ছিল; একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে;—এই পালক তিনটি যে সত্ত্ব রজ

তম, ঋক্ যজুঃ সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ কাল পশু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কী লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরী হইতেছে; দুইজন এম্ এস্ সি ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাব্ জজ্ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগ্নেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য কমিটির গৃহীসভ্য হইতে হইল। গৃহীসভ্যের কর্ত্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহীসভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ, অনেক সময় থার্ম্মমিটরের পারার মত সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে ওঠা নামা করে। অংশ কসিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু এই ভুল-চুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড় কিছু বাকী রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতিমাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ীর ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করচ কি? মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, "তা'ই ত, কি করি!" ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তা'কে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁক্‌বে?"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল, তার মর্ম্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

(৩)

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে, এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না, তা আমি কেমন করে' জান্‌ব?"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন, তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন করে জান্‌লেন?"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েচ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্ম্মিণী করে নিয়েচেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা' কি জান্‌তে পারি?"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এস।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দ্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখতে পাচ্চ ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা যাচ্চে কিন্তু সেটা যে কি তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চি নে।"

"শাদা কিছু দেখ্‌চ কি ?"

"শাদাই ত বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মত ?"

"নিশ্চয়ই বরফ ! কখনো পাহাড় ত দেখি নি তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লঙ্‌চু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড !

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল সাধনা আরো অনেক বেশী কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষমাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল সেই লঙ্‌চু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া

লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেই দিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না কিন্তু আর চল্‌চে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েচে, কোন্ দিন আমার বিষয় ক্রোক্ করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণ-ভাবে আপন সহধর্ম্মিণী করিতেছেন—বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই যে দেনা এও সেই লঙ্‌চু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে, এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কি বাবা ?"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায় ?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড় পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারচেন না ?"

"একি ? বরদা নাকি ?"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড়-কাচা কল কম্পানির ভ্রমণকারী এজেণ্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় করে' দিতে পারি।" বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ্ পকেট হইতে বাহির করিল।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।